শেষমেশ, চিত্রকর আমার মনের বিস্ময় প্রকাশের ছবি।

শৈবাল মিত্র

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ছবি বানিয়ে ফেলার পর চলচ্চিত্রকারের দায় বা দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। ছবিটির ভালমন্দ নিয়ে তর্ক চলে। পক্ষে বিপক্ষে মত শোনা যায়। ছবিতে লগ্নীকৃত অর্থ ফেরত আসবে কী আসবে না তা নিয়ে উদ্বেগের দিন কাটে। তারপর সব চুকে গেলেও থেকে যায় আরও একটি প্রশ্ন, চলচ্চিত্রকার ছবিটি কেন বানালেন?

অবশ্য সব ছবির ক্ষেত্রেই এমন প্রশ্ন ওঠে বা উঠবে তা নয়। যেসব ছবি দর্শকের স্মৃতি থেকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায়, সেইসব ছবির নির্মাতারা বেঁচে যান। তাঁদের নিয়ে কেউ তেমন টানাটানি করে না। কিন্তু যেসব ছবি রয়ে যায় দর্শকদের মনে, তাদের নির্মাতাদের রেহাই নেই। উত্তর দিতেই হয়। এই গোত্রের চলচ্চিত্রকাররা সৌভাগ্যবান কিনা জানি না, কিন্তু আমার কাছে তা বেশ বিড়ম্বনার কারণ। যে কোনও সার্থক শিল্পকর্মের 'অন্তরতম হে'-র অবস্থান এতটাই গভীরে যে তার সন্ধান পেতে রসিককে কালের দূরত্ব পার হতে হয়। স্রষ্টার সাধ্য নেই সেই কাল পারাবারে পৌঁছনোর। তাই ছবিটি তৈরি করার নানা স্মৃতি ও ভাবনার কথাই আমি বলতে পারি উক্ত প্রশ্নের উত্তরে।

'চিত্রকর' ছবিটি আমি বানিয়েছিলাম ২০১৬ সালে। যদিও এর কাজ শুরু করি ২০১৫তে। মার্কিন চিত্রশিল্পী মার্ক রথকোর জীবনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি নাটক লিখেছিলেন আমেরিকার প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার জন লোগান, নাম 'রেড'। নাটকটির মধ্যে দিয়ে পঞ্চাশের দশকে শিল্পজগতে আধুনিক ও উত্তর আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে একজন শিল্পীর হতাশা, ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও পুঁজি নির্ভর বাজার অর্থনীতিকে অস্বীকার করার স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যদিকে আরও এক শিল্পী যিনি আমাদের দেশের, বলতে গেলে আমার দেশগাঁ শান্তিনিকেতনের শিল্পী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কিছুটা আত্মজীবনী গোছের লেখা 'কত্তামশায়' আমার খুব ভাল লেগেছিল। লেখাটির মধ্যে একজন শিল্পী তাঁর অন্ধত্ব ও মৃত্যুকে অস্বীকার করে নিজের নিয়তির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার স্পর্ধা, আত্মমগ্নতা, শিল্পীর ঐতিহ্য চেতনা ও স্বাধীনতা ইত্যাদি আমাকে নাড়া দিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এই দুই শিল্পী শিল্পভাবনায় দুমেরুর হয়েও দুভাবে নিজেদের সংকটের উত্তর খুঁজতে নেমে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছেন, যেখানে দুজনের মধ্যে শিল্পী হিসেবে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের প্রাচীর আর নেই। মননে সৃজনে তাঁদের দুজনেরই পরিচয় তখন এমন এক চিত্রকরের, যিনি তাঁর শিল্পমাধ্যমটিকে আঁকড়ে বাঁচতে চান তার ভিতর ও বাইরের যাবতীয় বাধাকে অতিক্রম করে।

চিত্রকর ছবির কাজ শুরু করে মনে হয়েছিল, যে দুই শিল্পীর জীবনের ঘটনা নিয়ে আমি চিত্রনাট্য লিখতে বসেছি তার বাস্তবতা, শিল্পভাবনা ও সময়কালকে একটি চলচ্চিত্রের পরিসরে এনে বসানো যাবে না। বরং চলচ্চিত্রটির যে বাস্তবতার পরিসর, ঘটনাগুলিকে নতুন ছাঁচে বিন্যস্ত করে নিয়ে মিশিয়ে দিতে পারলে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বেড়াকে আমি পার

হয়ে যেতে পারব। ফলে লেখা হতে লাগল একজন অন্ধ চিত্রকরের কথা যাঁর নাম বিজন বসু। বিজন কলকাতা শহর থেকে দূরে 'একলা' নামের এক গ্রামীণ আধা শহরে একটি বাড়ি ও স্টুডিয়ো বানিয়ে জীবনযাপন করেন, সেই আধা শহরের কেউই তাঁর আসল পরিচয় জানে না। সেখানে তাঁর পরিচয় 'কত্তামশায়' হিসেবে। অন্ধ হলেও তিনি যে ছবি আঁকতে পারেন সেটা তাদের কাছে বিস্ময়ের! স্টেশনমাস্টার হেমেন বিজনের গুণমুগ্ধ ভক্ত। বিজনের একমাত্র কথা বলার ও প্রাত্যভ্রমণের সঙ্গী। এই বিজন বসুকে কলকাতার একটি গ্যালারির মালিক শহরের এক রেস্তোরাঁর দেওয়ালে লাগানোর জন্য একটি ম্যুরাল তৈরির বরাত দেয়। সেই কাজে তাঁকে সাহায্য করতে কলকাতা থেকে প্রতিভাবান শিল্পী তিথিকে পাঠায় সাহায্য করার জন্য। ছবিটি এই দুজনের মধ্যে ওই ম্যুরাল তৈরির সময়ের নানা কথোপকথন ও ঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

ছবিতে ইচ্ছে করেই বিনোদবিহারীর আঁকা ছবির ব্যবহার করা হয়েছে বিজন বসুর কাজে নমুনা হিসেবে। বিনোদদার কাজ এইজন্য ব্যবহার করেছি ছবির জন্য যদি আঁকানোর চেষ্টা হত তাহলে তা কখনই ওই উৎকর্ষতার উচ্চতায় পৌঁছত না। অন্যদিকে ছবিগুলি বিজনের 'একলা' গ্রামশহরের পারিপার্শিক পরিবেশ ও আঁকা ছবির মধ্যেকার সম্পর্ক স্থাপন করতে সাহায্য করেছিল। যেটা করতে গিয়ে বিনোদবিহারীর ছবি মাঝে মাঝেই ছবির শট হয়ে উঠেছে। আঁকা ছবির ক্যানভাস বদলে গেছে ছবির শটে কিংবা শট মিশে গেছে বিনোদবিহারীর ক্যানভাসে। এর ফলে ছবির বাস্তবতায় একটা অন্য মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

এই কাজ করতে বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্য যেমন নিতে হয়েছিল তেমনি প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া বিনোদদার ম্যুরালের শট নিয়ে তাকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পুনরুদ্ধার করতে হয়েছিল নানান প্রিন্ট রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে। বিনোদদার কাজের এমন ব্যবহারে

অনেকের আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু আমার মনে হয়েছে এর ফলে সাধারণের মধ্যে বিনোদদার কাজ দেখার একটা সুযোগ তৈরি হয়ে উঠেছে অন্যভাবে।

মার্ক রথকো ও বিনোদবিহারীর জীবনের কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও এই ছবি কোনও ভাবেই এঁদের কারওরই জীবনী নয়। বরং এই ছবি বাজার অর্থনীতির পরিবেশের সঙ্গে যে কোনও শিল্পীর শিল্পবোধের সংঘাত ও অস্তিত্ব সংকট এমন বলা যেতে পারে। সেইসঙ্গে শিল্প কী ও কেন এই নিয়ে আলাপ তৈরি করে ছবিটি। হয়তো এই আলাপ আমার নিজের মধ্যে চলে নিরন্তর। কেন ছবি করি, ছবি করেই বা কী হয় এমন সব প্রশ্ন মনের একান্তে ঘোরাফেরা করে। শিল্প যদিও আমার পেশা তবু যেহেতু সেই পেশা শিল্পকে কেন্দ্র করে তাই আমি শিল্পী, নাকি নেহাতই একজন চলচ্চিত্র কারিগর তা নিয়ে নিরন্তর ভাবনার স্রোত বয়ে চলে মনে।

ছবিটির শেষে দেখা যায় তিথির সঙ্গে শিল্প কী ও কেন নিয়ে বিজনের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্কের পর অদ্ভুত এক ক্ষমতাবলে বিজন যে ম্যুরালটি তৈরি করে ফেলেন তা তিথির দৃষ্টিতে শিল্পের সুউচ্চ চূড়া অনায়েসে স্পর্শ করে। যে চূড়ায় পৌঁছতে তিথি নানাভাবে চেষ্টা করলেও তার কাছে অধরাই থেকে গেছে।

সন্ত কবীরের একটি দোহা এই সময় নেপথ্যে ভেসে আসে। দোহাটির প্রথম চরণ এইরকম, ‘মোকো কাঁহা ঢুন্ডে রে বন্দে, ম্যায় তো তেরি পাস মে’। এই খোঁজ চলেছে বিশ্বজুড়ে সব শিল্পীর ভিতর। নিজের অন্তরের ‘অন্তরতম হে’-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ যে শিল্পীর জীবনে ঘটে তিনিই হয়ে ওঠেন কালজয়ী। যে অন্তরতমর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের গান পাই, ‘তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী! আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি’। আমার এই বিস্ময়ের প্রকাশ রয়েছে চিত্রকর ছবিতে।

চিত্রসূত্রঃ ‘চিত্রকর’ ছবির কিছু স্থিরচিত্র। চরিত্রাভিনেতা - ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রস্বত্ত্বঃ লেখক

Copyright © 2020 Saibal Mitra, Published 31st Dec, 2020.

শৈবাল মিত্রর জন্ম ১৯৫৭। বাংলা সমান্তরাল চলচ্চিত্র জগতের এক সুপরিচিত নাম। বিশ্বভারতীর স্নাতক শৈবাল নানা ধরনের ছবি করেছেন - তথ্যচিত্র, কাহিনীচিত্র, ক্ষুদ্রচিত্র থেকে দূরদর্শন ধারাবাহিক - বাংলা ও হিন্দিতে। ২০০০ সালের BFJA পুরস্কারপ্রাপক শৈবাল একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছেন ভারতীয় প্যানোরামায় অন্তর্ভুক্তির কারণে। সহ-পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন গৌতম ঘোষ ও রোনাল্ড জফের সাথে। ২০১৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘চিত্রকর’ ওঁর অন্যতম প্রশংসিত ছবি।